চট্টগ্রাম মঞ্চ — ২৭ আগস্ট ২০০৭ইং সোমবার

স্মরণ

# লোকমান খান শেরোয়ানী

নিলুফারুল আলম

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর অন্যান্য মুসলমানদের মত পাঠানরাও এ পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। পাঠানরা পাঠানটুলীর রাস্তায় চলাচলরত বৃটিশ কর্মচারীদের নানাভাবে উত্যক্ত করত। এভাবে তারা বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে পতিত হয়। এ বৃটিশদের হাতে পাঠানটুলীর পাঠানেরা প্রায় সকলে নিহত হয়। অলৌকিকভাবে তাদেরই এক মেয়ে বেঁচে যায়। এ মেয়ে তখন সন্তান সম্ভবা ছিল। তাঁর গর্ভে পাঠান বাড়ির মূল পুরুষ বাবু খাঁর জন্ম হয়। অনুমান করা হয় চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনের সামনে যে ভঙ্গীশার মাজার ঐ ভঙ্গীশা ছিলেন পাঠান বংশীয়। ভঙ্গীশার পালিত কন্যার সাথে বাবু খাঁর বিয়ে হয়। বাবু খাঁর এক পুত্র নাম জুমন খাঁ। তাঁর পুত্র আলেফ খাঁ। আলেফ খাঁর চার পুত্র, যথাক্রমে-মসউদ খাঁ, ইয়াকুব খাঁ, সিদ্দিক খাঁ এবং উমর খাঁ। এই আলেফ খাঁর বংশধররা পাঠানটুলীর পাঠানবাড়িতে বসবাস করতে থাকে। এ পাঠান বংশীয়রা মূলতঃ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের ব্যবসার ব্যাপ্তি রেঙ্গুন, আকিয়াব, কলকাতা পর্যন্ত ছিল। আলেফ খাঁর পুত্রদের মধ্যে উমর খাঁ একজন সার্থক ব্যবসায়ী ছিলেন। উমর খাঁর দুইপুত্র ও দুই কন্যা, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে তমিজা খানম, লোকমান খান, জামাল খান ও জেরিনা খানম।

১৯১০ সালে ১৮ আগষ্ট পাঠানটুলীর পাঠান বাড়িতে লোকমান খান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উমর খাঁ ও মাতা হাজেরা খাতুন।

লোকমান অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান সুন্দর সুঠামদেহের অধিকারি ছিলেন। অত্যন্ত লম্বা স্থূলকায় দেহ এমন ছিল যা নিজেকে নিজে বহন করা অসাধ্য ছিল, কৈশোরে দেহভারের বদৌলতে তিনি নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে অক্ষম হন। অষ্টম শ্রেণী অধ্যয়নকালে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা স্থগিত হয় কিন্তু জ্ঞানার্জনে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। পাঠাগারের সাথে যোগাযোগ রেখে তিনি তাঁর শিক্ষাকে পাকাপোক্ত করে নেন। বড় ভাইয়ের জ্ঞান স্পৃহার এ প্রভাব ছোট বোন জেরিনা খানমকে আলোড়িত করে। ভ্রাতার সাথে ভগ্নিও হয়ে উঠে আর এক জ্ঞানী গুণিজন। কথিত আছে লোকমান খান 'শেরওয়ানী' এ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তার কারণ আমার এখনও অজানা রয়েছে। জীবনের তাগিদে জীবিকার পেশা বা নেশার কোন চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি অত্যন্ত দেশ প্রেমিক ছিলেন। যৌবনে তিনি রাজনীতির বলয়ে জড়িয়ে পড়েন। তিনি স্বরাজী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতির নাগ পাশে যুক্ত থাকায় তিনি কয়েকবার রাজবন্দীও হয়েছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকায় আলম পরিবারের সন্তান কবি দিদারুল আলমের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরে তৎকালীন দৈনিক পূর্ব পাকিস্তানের সম্পাদক কবি আবদুস সালামের সম্পর্ক হয়। লোকমান খান শেরোয়ানীর সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর ছোটবোন জেরিনা খানমের সাথে ওহীদুল আলমের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়। ভারত ও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর যোগসূত্র থাকায় বাড়িতে বড় বড় নেতাদের নিয়ে ভোজের আয়োজন হত। লোকমান খান খুবই ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাই তাঁর আমন্ত্রিত অতিথিরা রাজভোজ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতেন। বাড়িতে বিবাহ মেজবান অনুষ্ঠানে রান্না শেষে তিনি প্রথমে বড় এক বাটি গোশত অনায়াসে সাবাড় করে দিতেন। লোকমান খান শেরওয়ানীর আর একটা অভ্যেস ছিল। বেলভাত খাওয়া। তাঁর মা তড়িঘড়ি করে বেলা থাকতে তাঁর খাবারের আয়োজন করতেন, বেলা ডুবে গেলে তিনি মুখে খাবার তুলতেন না। তবে আমরা তাঁর সে অভ্যেস দেখিনি। তাঁকে দেখবার এবং জানবার যখন সময় হয় তখন তিনি পৌঢ়ত্বে পৌছেছেন।

লোকমান খান শেরওয়ানী আমার বড় মামা ভাগ্নী, ভাগ্নের প্রতি যে অকৃত্রিম উজাড় করা মায়া মমতা আমার মামার মত আর কারো ছিল বলে আমার মনে হয় না। তাঁর মেজাজ ছিল কড়া কিন্তু অন্তর ছিল মমতায় ভরা। তিনি খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর মুক্ত চেতনা, স্পষ্টবাদীতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার দরুন তিনি শত্রুর কবলে পড়েন। আনুমানিক ১৯৬৪/৬৫ দিকে তিনি শত্রুর একটি জীপের ধাক্কায় দুর্ঘটনা কবলিত হন। দুর্ঘটনায় তাঁর পদযুগলের হাঁড় ভেঙ্গে যায়। তাতে তিনি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

লোকমান খান শেরোয়ানীর বিশাল দেহের পোষাক ছিল সাদা খদ্দরের তহবন্দ ও পাঞ্জাবী, মাথায় নেহেরু ষ্টাইলের খদ্দরের টুপি। মাঝে মধ্যে মোটা খদ্দরের পায়জামা পরতেন। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি তাঁকে ভিন্ন কাপড় পরিধান করতে দেখিনি। মোটা সাদাসিদে পোষাকে তাঁকে চমৎকার লাগত। চোখ নাক, ভুরু, ঠোঁট মুখে চাপ দাড়ি গায়ের রং ফর্সা সব মিলে তিনি একজন সুপুরুষ ছিলেন বটে।

তাঁর সাংস্কৃতিক মনোভাব ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ হেতু অনেকে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ত। বিশেষ করে অনেক হিন্দু মহিলা তাঁর প্রতি প্রেম প্রীতি জ্ঞাপন করতে দ্বিধা করতনা। অবশেষে তিনি ধনী পরিবারের একজন হিন্দু রমনীকে বিয়ে করেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হন। তার নাম ছিল শিশির কণা। মুসলিম হবার পর তিনি শবনম খানম নামে অভিহিত হন। লোকমান খানের পরিবারে ইসলামী নিয়ম নীতি অত্যন্ত কঠোর ছিল, ইসলামী রেওয়াজ মত ধর্ম ও পর্দা প্রথা সুদৃঢ় ছিল। শবনম খানম শ্বশুরবাড়ির সে রেওয়াজগুলো মৃত্যু অবধি পালন করে গেছেন। তিনি শিক্ষিত ও একজন ভাল রবীন্দ্র সংগীত গায়িকা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর নির্দেশমতে তিনি তাঁর সে গান গাওয়া স্থগিত রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। লোকমান খান হিন্দু রমনী বিয়ে করে তাঁর ইসলাম ধর্মকে জলাঞ্জলি না দিয়ে স্ত্রীকে তাঁর ধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে কিভাবে সার্থক হয়েছেন তা শবনম খানমের জীবন চরিত্রে প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি গভীর ভালবাসা তা তাদের দু'জনকে দেখে প্রতীয়মান হয়। লোকমান খান শেরওয়ানী আমার বড় মামা ভাগ্নী, ভাগ্নের প্রতি যে অকৃত্রিম উজাড় করা মায়া মমতা আমার মামার মত আর কারো ছিল বলে আমার মনে হয় না। তাঁর মেজাজ ছিল কড়া কিন্তু অন্তর ছিল মমতায় ভরা। তিনি খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর মুক্ত চেতনা, স্পষ্টবাদীতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার দরুন তিনি শত্রুর কবলে পড়েন। আনুমানিক ১৯৬৪/৬৫ দিকে তিনি শত্রুর একটি জীপের ধাক্কায় দুর্ঘটনা কবলিত হন। দুর্ঘটনায় তাঁর পদযুগলের হাঁড় ভেঙ্গে যায়। তাতে তিনি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

আমার বড় মামী আমানত খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। মামার চার ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। আমার মামী যৎ সামান্য আয় দিয়ে এ বিশাল সংসারের ব্যয়ভার বহন করতে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছিলেন। কিন্তু মামার প্রতি তাঁর অফুরন্ত প্রেম-ভালবাসা তিনি হাসিমুখে সব দুঃখ বরণ করে নিয়েছিলেন। আগেই বলেছি মামা অত্যন্ত পড়ুয়া ছিলেন। প্রথম কিছুদিন তিনি নিজে বই পড়তে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আমি দেখেছি শত কাজের অবসরে আমার মামী নিজে বই পড়ে মামার সে জ্ঞান পিপাসা নিবারনে সচেষ্ট থাকতেন।

মামার অকৃত্রিম স্নেহ, প্রেম-প্রীতির স্মৃতি স্মরণ হলে এখনও মামার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগে। এ যুগে এমন মনীষীর দেখা-পাওয়া ভার। ১৯৬৯ সালের ২৭ আগষ্ট এ মহামানবের অন্তর্ধান হয়। পরম করুণাময়ের দরবারে